কার্ল আরোন

মানুষ উড়ল আকাশে

ছবি এঁকেছেন
এরিক বেনিয়ামিনসন
ও বরিস কিশতিমভ

'রাদুগা' প্রকাশন • মস্কো

কার্ল আরোন

মানুষ উঠল আকাশে

ছবি এঁকেছেন
এরিক বেনিয়ামিনসন
ও বরিস কিশতিমভ

'রাদুগা' প্রকাশন • মস্কো
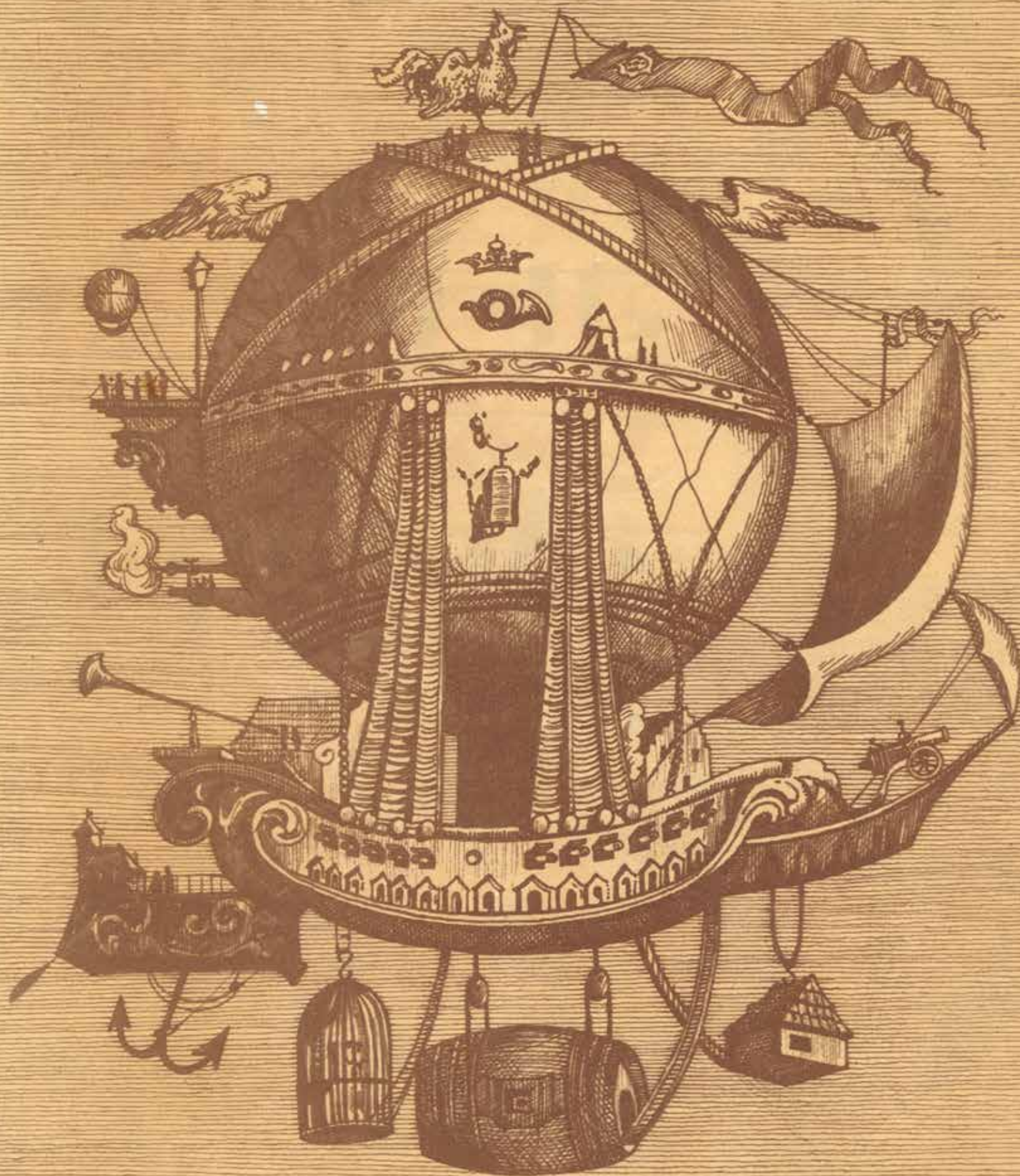
'আমরা জন্মে গল্পকে করি সত্য...'

(গান থেকে)

মানুষ দৌড়তে পারে হরিণের মতো, মাটি আঁকড়ে যেতে পারে সাপের মতো, মাছের মতো ভেসে যেতে পারে। শুধু পাখির মতো উড়তে পারে না। আকাশে উড্ডীন পাখিদের দেখে যুগের পর যুগ লোকে এই ভেবে হিংসে করেছে। ভেবেছে আর স্বপ্ন দেখেছে: 'নিঝুম বনের ওপর দিয়ে মেঘগুলোকে ছাড়িয়ে উড়ে যাব উড়ন্ত গালিচায় চেপে!.. নাকি পালক দিয়ে পাখা বানিয়ে আকাশে উঠব!' তবে পাখাওয়ালা মানুষ কি উড়ন্ত গালিচা বহুদিন ছিল কেবল গল্প।

শোনা যায় অবিশ্যি অনেক কাল আগে মস্কোয় এক চাষী পাখা বানিয়েছিল চামড়া দিয়ে। ময়দানে লোকজন ডেকে সে ঘোষণা করলে যে উড়ে যেতে পারে নাকি বলাকার মতো। কৌতূহলীরা জুটল সবাই, দেখতে চায় কী ঘটবে। চাষী তার কাফতান খুলে ফেলে কাঁধে বেঁধে নিলে দুই পাখা। 'ওড় এমেল্‌কা!' চেঁচায় লোকেরা। কিন্তু যতই সে ছোটাছুটি করুক, যতই ডানা নাড়ুক, মাটি ছেড়ে ওঠা তার আর হল না। তা দেখে একদল হাসাহাসি করলে, টিটকারি দিলে, অন্যেরা গম্ভীরভাবে মাথা নাড়লে: 'বোঝা যাচ্ছে, মাটি ছেড়ে যাবার কপাল নেই মানুষের।'

কিন্তু ঘটল অন্যরকম।
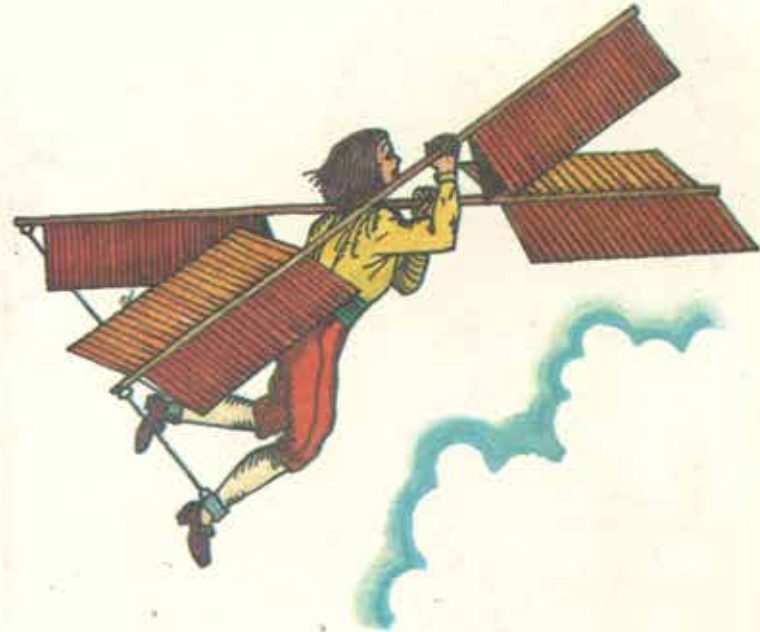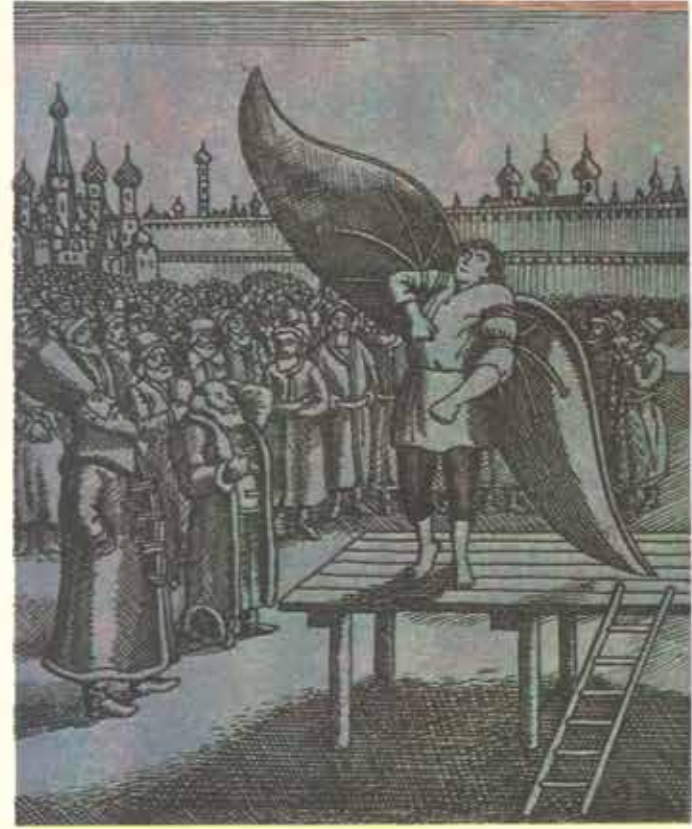
শূন্যে ভাসার জন্য কত রকমের ডানাই-না মাথা খাটিয়ে বার করেছে মানুষ!
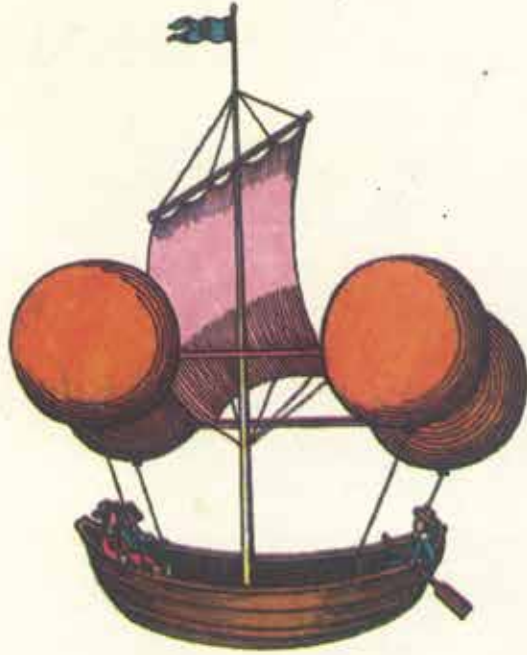
ফ্রাঞ্চেস্কো দি লানা'র উড়ন যন্ত্র — বেলুনের একটি আদি প্রকল্প।

মঙ্গোলফিয়েরে প্রথম আকাশযাত্রী — ভেড়া, মোরগ আর হাঁস।

মানুষ উঠল আকাশে

অনেক দিন আগে দক্ষিণ ফ্রান্সের ছোট্ট এক শহরে থাকত দুই ভাই — জোসেফ আর এতেঁ মঙ্গোলফিয়ের। জানবার ইচ্ছে এদের ছিল প্রবল, বুদ্ধিমত্তাও প্রখর। চিমনি থেকে ধোঁয়া উঠতে দেখে দু'ভাই বহুবারই নিজেদের জিগ্যেস করেছে — কেন ওঠে? ঠিক করলে, গরম বাতাস ঠাণ্ডার চেয়ে হালকা, তাই ওপরে ভেসে উঠছে। ভাইয়েরা তখন কাগজ দিয়ে মস্তো এক বেলুন বানালে, বেলুন ভরে তুলল অগ্নিকুণ্ডের ধোঁয়ায়। সঙ্গে সঙ্গে বেলুন উঠে গেল আকাশে, দ্রুত বাড়তে থাকল তার গতি...

কাটল কয়েক মাস। মঙ্গোলফিয়েরদের বেলুনে প্রথম উঠল মানুষ। নাম তার পিলাত্র্ দ্য রোজিএ।

শত শত কৌতূহলী প্যারিসবাসীতে ভরে গেল প্রশস্ত স্কোয়ার, লোকে উঠল বাড়ির চালে, চিমনিতে।

— আপনি দেখেছেন ওই ভুতুড়ে দৃশ্যটা, মঙ্গোল-ফিয়েরের ওড়া?
— দেখেছি ছোটবেলায়। আর শুধু আমিই নই, স্বয়ং রাজাও ওড়াটা লক্ষ করেছেন।

শোনা গেল উৎক্ষেপের সংকেত। ধোঁয়ায় ভরা বেলুন ধীরে ধীরে উঠতে লাগল স্কোয়ারের ওপরে। জনতা সোল্লাসে চিৎকার করে উঠল:

'মানুষ উঠেছে আকাশে!.. সাবাস পিলাত্র্!..

বাতাসের আচমকা ঝাপটায় বেলুন ভেসে গেল গাছে। আর এক সেকেণ্ড — ডালের খোঁচায় বেলুনের খোল এই ছিঁড়ল বলে। কিন্তু পিলাত্র্ ঘাবড়াল না, বেলুনেই যে অগ্নিপাত্র বসানো ছিল, তাতে সে একমুঠো খড় ছুঁড়ে দিলে। তপ্ত বাতাস ছুটল খোলের দিকে, বেলুন বাধ্যের মতো ওপরে উঠে ভেসে গেল গাছের ওপর দিয়ে।

'কী, কেমন লাগল?' বেলুন মাটিতে নামলে জিগ্যেস করা হল পিলাত্র্কে।

'চমৎকার!' উচ্ছ্বসিত হয়ে চেঁচিয়ে উঠল নির্ভীক বায়ুচর, 'একেবারে স্বপ্ন!'

১৭৮৩

এয়ারোস্ট্যাটের ঝুড়ি। তাতে আছে ভারের বস্তা। এয়ারোস্ট্যাটকে আরো ওপরে ওঠাতে চাইলে বস্তাটা ফেলে দেয়া হত।

১৮৫২ সাল

বাষ্পীয় ইঞ্জিনের প্রথম ডিরিজাব্‌ল্‌ নির্মাণ করেন ফরাসি জিফ্‌ফার।

'টর্পেডোবাদী হাওয়াই জাহাজের' নকশা — ম. মালিখিন।

ক. এ. ত্‌সিওল্‌কোভ্‌স্কি কৃত সম্পূর্ণ ধাতব ডিরিজাব্‌লের মডেল।
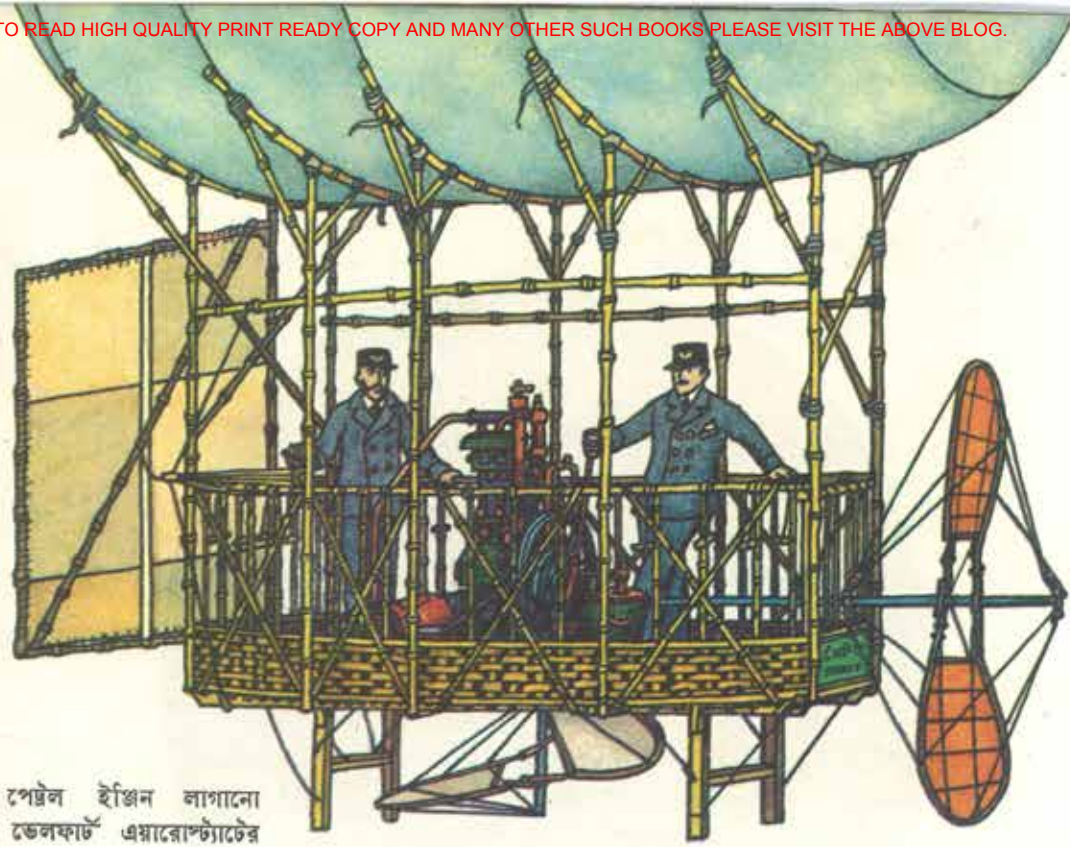
পেট্রল ইঞ্জিন লাগানো ভেলফার্ট এয়ারোস্ট্যাটের গণ্ডোলা।

আকাশে ভাসে মাছ

বেলুনে প্রথম ওড়া হয় প্রায় দু'শ বছর আগে। তারপর থেকে লোকে অনেক বার আকাশে উঠেছে বেলুনে, যাকে বলা হয় এয়ারোস্ট্যাট। শুধু তা ভর্তি করা হত ধোঁয়ায় নয়, হালকা গ্যাসে। পরে এয়ারোস্ট্যাটে বসানো হল প্রপেলার সমেত ইঞ্জিন — দাঁড়াল ডিরিজাব্‌ল্‌ — যা চলবে হুকুম মেনে।

বাতাসে ভাসলে তাকে দেখায় প্রকাণ্ড এক মাছের মতো। পেছনে লেজ, পেটের ভেতর ঝুলন্ত গণ্ডোলা, যেন পাখনা। গণ্ডোলায় চেপে ইঞ্জিন চালিয়ে দিয়ে যাও না যেখানে খুশি। এটা বেলুনের মতো নয়। তাতে সবকিছু নির্ভর করত বাতাসের ওপর। যেদিকে বাতাস বইবে সেইদিকেই যাবে বেলুন।

আকাশে ভাসছে ডিরিজাব্‌ল্‌, আর তার ওপরে ডানা মেলা প্রতিযোগী রুপোলি পাখি — বিমান, আগে যাকে বলা হত এরোপ্লেন।

তবে তার কাহিনীটা ভিন্ন।
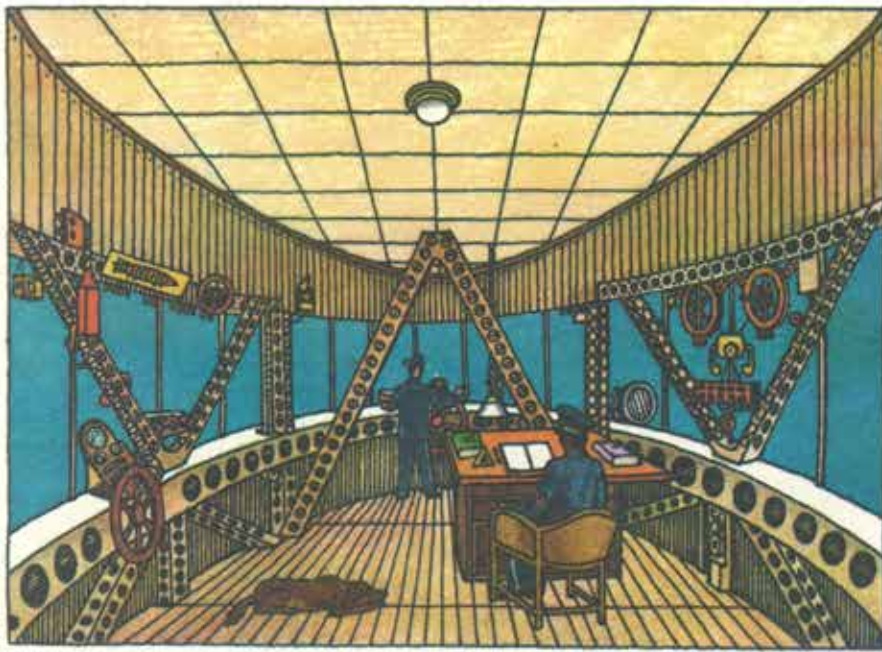
ডিরিজাব্‌লের চালনা-কক্ষ ক্যাপটেনের মঞ্চের মতো।
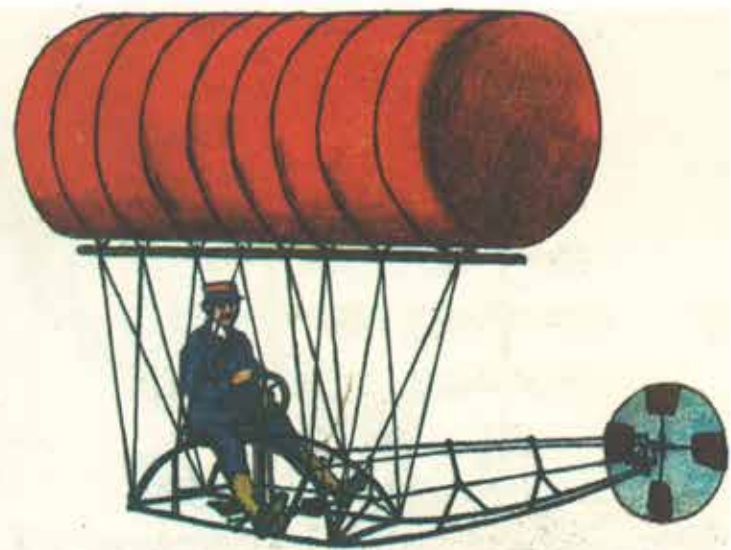
আমেরিকান রিচেলের 'উড়ন্ত বাইসাইকেল'।

সোভিয়েত ডিরিজাব্‌ল্ 'অসোয়াভিয়াখিম'। ১৯৩৬ সালে এতে দীর্ঘস্থায়ী উড্ডয়নের রেকর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়।

পত্ত দ'আমেকুর ও দ্য লা-লান্দেল কৃত উড়ন্ত জাহাজের প্রকল্প।

বাতাসের চেয়ে ভারী

বেড়া দেওয়া চওড়া মাঠে জড়ো হল একদল অফিসার। উৎসুক হয়ে তারা দেখল অভিনব এক যন্ত্র — চতুষ্কোণ দুই ডানা, আর লেজ সমেত চাকার ওপর বসানো লম্বা নৌকো। তিনটে প্রপেলার, একটা সামনে, দুটো দু'পাশে বাষ্পীয় ইঞ্জিনের সঙ্গে জোড়া। রুশ অফিসার মোজাইস্কির বানানো প্রথম এরোপ্লেন এটি। সবাই উন্মুখ হয়ে ছিল পরীক্ষার জন্য। বাতাসের চেয়ে ভারী যন্ত্রে শূন্যে ওঠার চেষ্টা তো কেউ আগে করে নি।

শেষ পর্যন্ত থরথর করে উঠল ইঞ্জিন, ঘুরতে লাগল প্রপেলার, ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন যন্ত্রটা গতি বাড়াতে বাড়াতে ছুটল রেল লাইন ধরে। এবার তা লাফিয়ে উঠল, মুহূর্তের জন্য মাটির ওপর ভেসে থেকে হঠাৎ পড়ে গেল ডানার ওপর। ইঞ্জিন তখনো ছিল বড়ো দুর্বল আর ওজনে জগদ্দল। ভারী যন্ত্র বাতাসে ধরে রাখা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না।
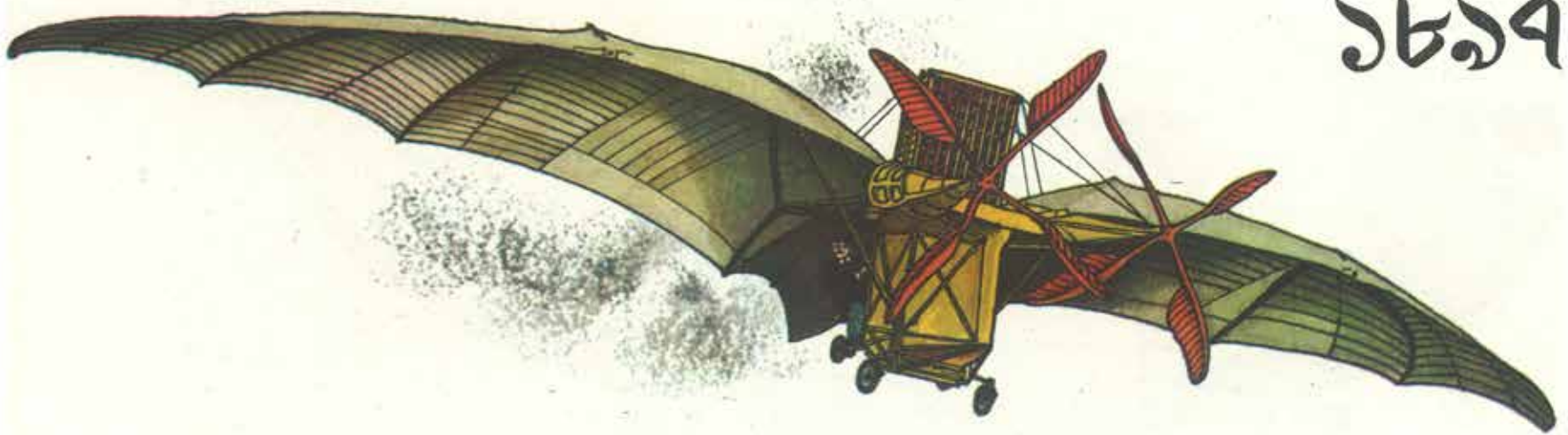
১৮৯৭

'আভিওন' — ফরাসি ইঞ্জিনিয়ার ক্লেমাঁ আদের কর্তৃক নির্মিত বাষ্পীয় ইঞ্জিনে চালিত অন্যতম প্রথম এরোপ্লেন। পাখা এর বাদুড়ের মতো, তবে অনেক বড়ো। প্রতিটি লম্বায় সাত মিটার। প্রপেলারের ফলা দেখে পাখির পালকের কথা মনে পড়বে।

১৮৮৫
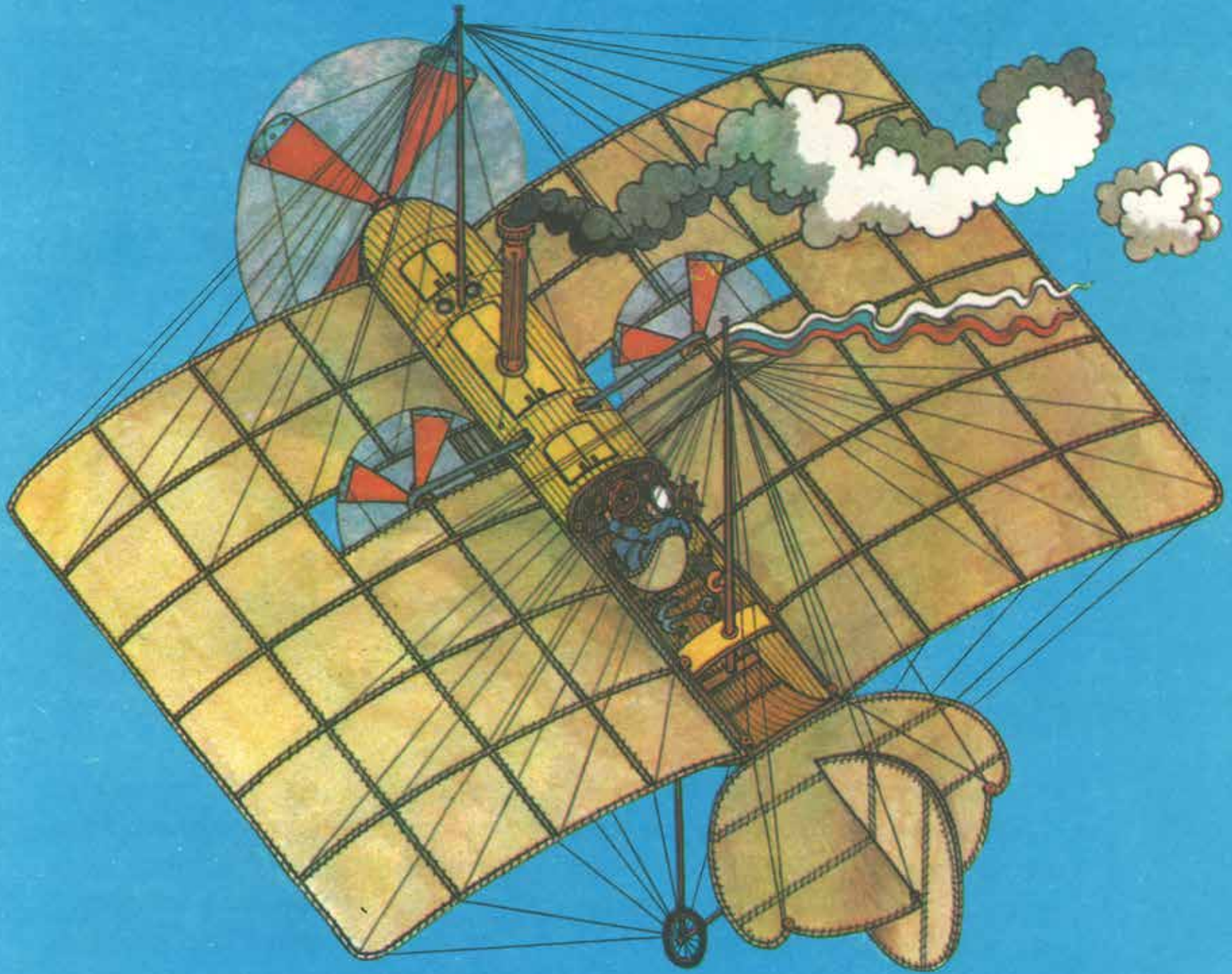
প্রথম শ্রেণীর ক্যাপটেন আ. ফ. মোজাইস্কি নির্মিত মনোপ্লেন (তথাকথিত এক ডানার বিমান)। অন্যান্য যন্ত্রের তুলনায় এটি আধুনিক বিমানের অনেকটা সদৃশ।

দুই ডানার প্লেনার-বাইপ্লেনে অট্টো লিলিয়েন্টালের উড্ডয়ন।

পক্ষি-মানব

দাঁড়িয়ে ছিল সে উঁচু টিলার ওপর ডানা মেলে, দূর থেকে তাকে মনে হচ্ছিল কোন এক আজব পাখি, শুধু কেন জানি পরেছে প্যাণ্ট আর কোর্তা। ডানা দুটিও অসাধারণ। পালকের বদলে তাতে আছে কাঠের ফ্রেমে লাগানো টুকরো টুকরো ক্যানভাস। উঠেছে তা একটার ওপরে আরেকটা, মনে হয় যেন পাল।

টিলার নিচে জমেছে কৌতূহলীরা।

'কে এই খেপা?' ছড়ি দিয়ে পাহাড়ের চুড়ো দেখিয়ে জিগ্যেস করলেন বাবু গোছের এক ভদ্রলোক,

'ইনি হের লিলিয়েন্টাল' — বললে পাশের লোকটা, 'বার্লিনের ইঞ্জিনিয়ার অট্টো লিলিয়েন্টাল।'

ভেবেছিল বলবে যে ওঁকে উড়তে দেখেছে সে এই প্রথম নয়, কিন্তু শোনা গেল কার উত্তেজিত কণ্ঠস্বর: 'উড়ছে!' মাথা তুললে সে। লোকটা ভেসে আছে মাটি থেকে মিটার তিরিশেক উঁচুতে, যেন ঘুড়ি থেকে ঝুলছে, যে ঘুড়ি ওড়াতে ভারি

১৯০০

রাইট ভাইদের প্লেনারে দেখা দিল আন্দোলনযোগ্য পাত-স্টিয়ারিং। পেছনে চালাবার স্টিয়ারিং, সামনে ওপরে ওঠার।

বিমান উদ্ভাবনের কিছু আগে অনেকের কল্পনায় ছিল এমনটা।
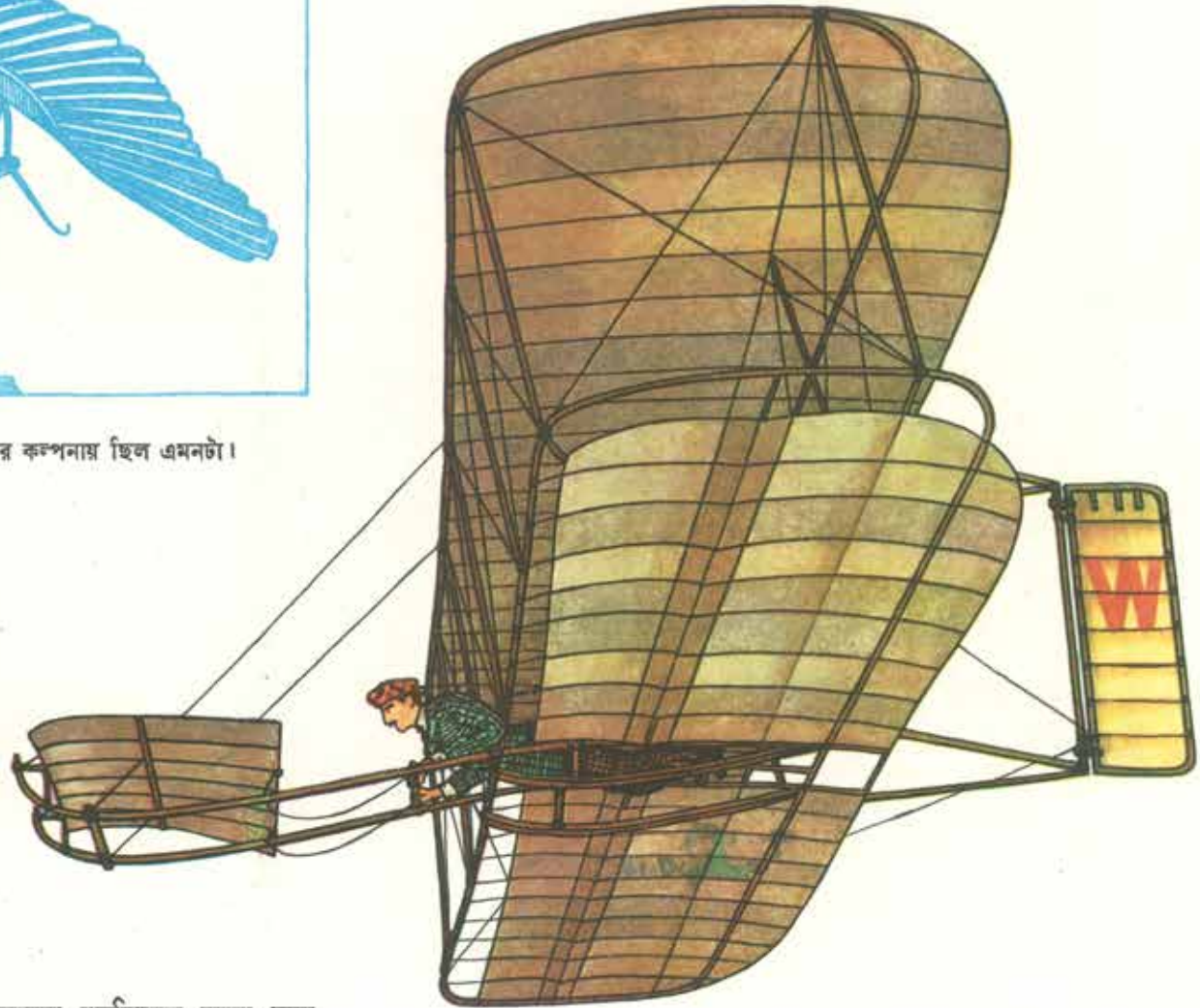
ভালোবাসে বাচ্চারা। ডানামেলা ঘুড়িকে বলা হত প্লেনার। যন্ত্রটা যখন টলে যেত, মনে হত এই উল্টে পড়ল বুঝি, লোকটা তখন পা বাড়িয়ে দিচ্ছিল উলটো দিকে, তাতে করে টাল সামলাচ্ছিল। এইভাবেই উড়ল সে।

কিছুক্ষণের মধ্যে প্লেনার ধীরে ধীরে নামল মাটিতে। লোকটা তাকিয়ে দেখল: 'আরে, প্রায় একশ' মিটার!'

ডানা মেলে ওড়ায় ইনিই প্রথম মানুষ।

উড়ন্ত ভাইয়েরা

উইলবার আর অরভিল রাইট থাকত আমেরিকায়। ছোট থেকেই তারা ভালোবাসত খেলনা বানাতে, ঘুড়ি তৈরি করতে, আর একটু বড়ো হতেই লাগল বাইসাইকেল মেরামতির কাজে। প্রতিবেশীরা বলত: 'আশ্চর্য গুণী ওদের হাত।'

একদিন ওরা কাগজে পড়লে লিলিয়েন্টালের মৃত্যুর খবর। ঝড় সামলাতে পারেন নি নির্ভীক বৈমানিক, তাঁর প্লেনার উলটে যায় এবং মারা যান তিনি। দু'ভাই তখন ঠিক করলে: 'নিজেদের প্লেনার বানাব আমরা, তাতে উড়তে শিখব। শুধু যাতে না ওলটে তার জন্যে কিছু একটা ব্যবস্থা করা দরকার।' ভেবে বার করলে তারা চালাবার স্টিয়ারিং।

'প্রপেলার লাগানো পেট্রলের ইঞ্জিন বসাতে পারলে বেশ হত। তাহলে আমাদের যন্ত্রটা নিজেই উড়তে পারবে, হয়ে যাবে বিমান।'

অনেকদিন ধরে খাটল দু'ভাই। শেষ পর্যন্ত তৈরি হয়ে গেল ইঞ্জিন। এবার পরীক্ষার দিন। শক্ত করে চালাবার স্টিয়ারিং চেপে ধরে অরভিল রাইট রইল যন্ত্রটার ডানায়। মাথায় লাগল বাতাসের ঝাপটা — চালু হয়ে গেছে প্রপেলার। দ্রুত ছুটতে ছুটতে হঠাৎ যন্ত্রটা উঠে পড়ল মাটি থেকে। বাতাসে ভাসল যন্ত্রটা। উড়ছিল তা অসমান ভাবে। কখনো ওপরে উঠছিল, কখনো নাক নিচু করছিল মাটির দিকে, তাহলেও প্রপেলারের গর্জনে মেতে উড়ছিল। তিরিশ মিটার উড়ে এরোপ্লেন নিরাপদে নামল মাটিতে।

'এবার আমার পালা' — বললে উইলবার। মাথার ক্যাপ সে টেনে বসিয়ে উঠল ডানায়।

সেদিন দু'ভাই আকাশে ওঠে চার বার। শেষের বারে তাদের বিমান প্রায় এক মিনিট ভাসমান থেকে উড়ে যায় পুরো ২৫০ মিটার।
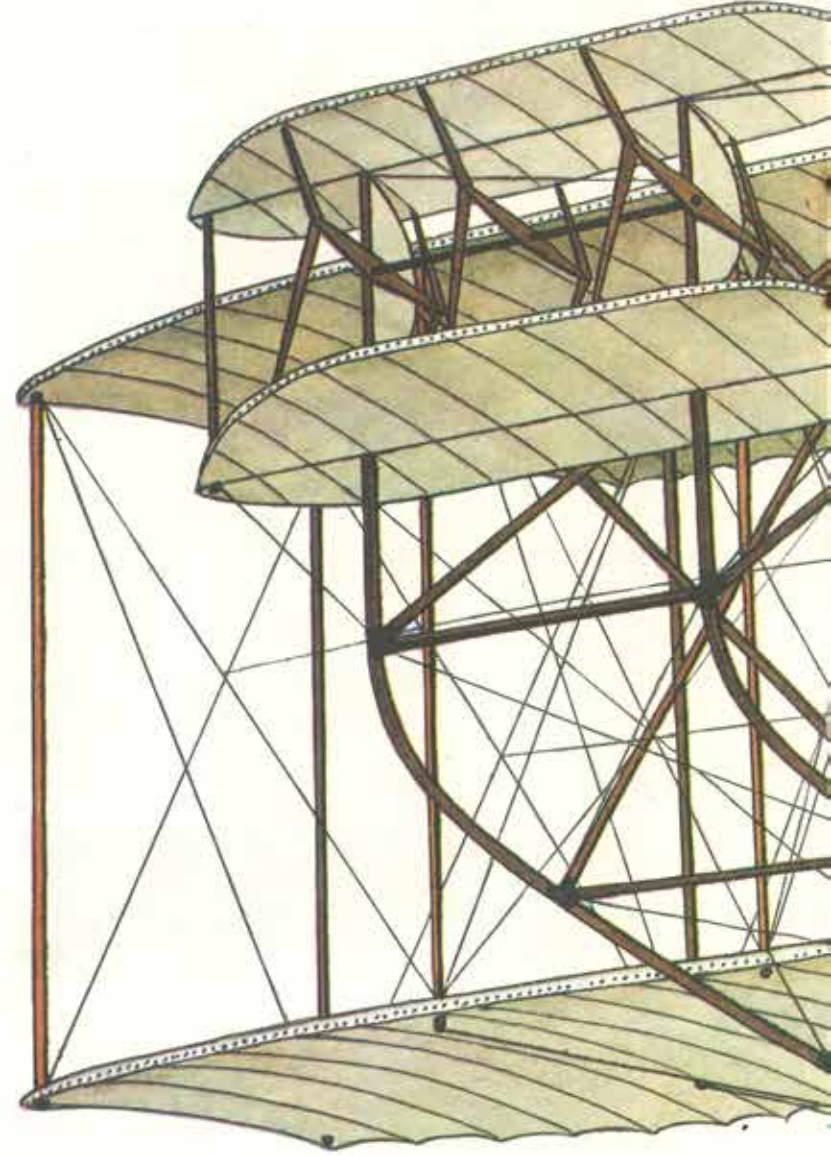
রাইট ভাইয়েরা এরোপ্লেনে প্রথম ওড়েন ও বিমান উড্ডয়ন বিকাশের সূত্রপাত করেন। ছবিতে পরবর্তী গঠনের একটি এরোপ্লেন 'রাইট'।
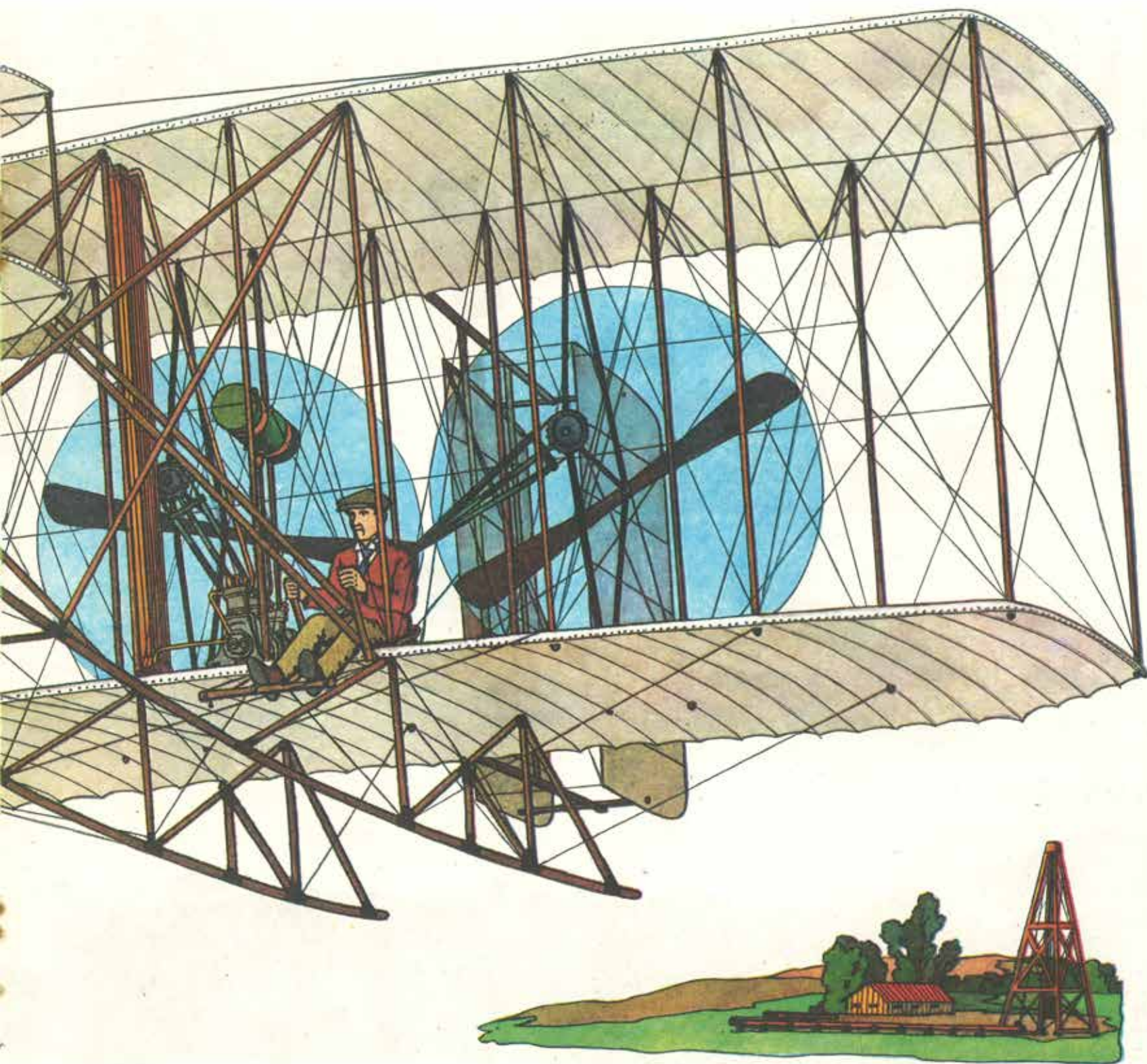
প্রথম উড্ডয়ন
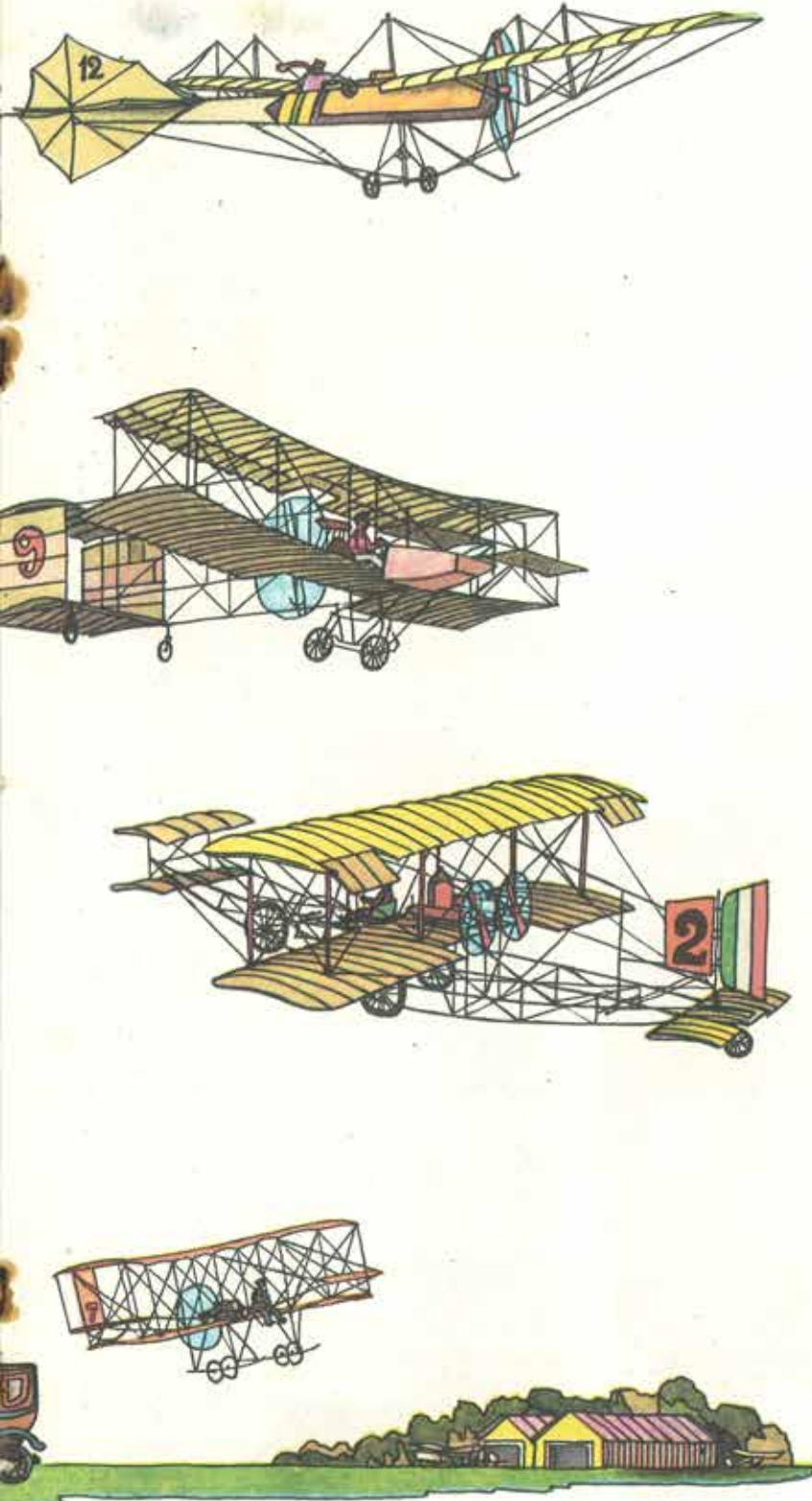
নতুন উদ্ভাবনটার কদর হয় নি সঙ্গে সঙ্গেই। 'খবরের কাগজে প্রকাশেরই তা যোগ্য নয়' — রাইট ভাইদের প্রথম ওড়ার খবর শুনে মন্তব্য করেন জনৈক মার্কিন সাংবাদিক, 'এরা যদি অন্তত এক মাইলও উড়তে পারত, তাহলে অন্য কথা। কিন্তু সেটা কখনো কেউ পারবে না।' ভুল হয়েছিল তাঁর। পাঁচ বছর না যেতেই নিজের বানানো বিমানে ফরাসি বৈমানিক ব্লেরিও এক শহর থেকে আরেক শহরে উড়ে যান। আর যখন চ্যানেল পার হয়ে ইংলণ্ডে নামলেন, অনেকেই বুঝল: এরোপ্লেন নেহাৎ একটা মজার খেলনা নয়।

প্যারিসের অদূরে ছোটো একটা শহরে বৈমানিকদের প্রথম প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা হয়। ছত্রিশ জন বৈমানিক এলেন নিজের নিজের বিমান নিয়ে। কোনোটা দেখতে সাপের মতো, কোনোটা প্রকাণ্ড ডাঁক মাছির মতো, কোনোটা আবার সাইকেলের চাকায় বসানো কী এক অদ্ভুত পাখি।

'সত্যিই কি উড়বে?' তারে বাঁধা ডানাওয়ালা বিদ্ঘুটে যন্ত্রটা দেখে অবাক হচ্ছিল লোকে।

কাঠের দুই পোস্টের মাঝখানে প্যাডেলে পা দিয়ে ডানার ওপর বসেছে চামড়ার জ্যাকেট পরা একটি লোক। প্রপেলার ঘোরাল মেকানিক। ডাক ছেড়ে বিমান ছুটল ঘাসের ওপর দিয়ে, চাপড়াগুলোর ওপর লাফাতে লাফাতে। কয়েক সেকেণ্ড যেতেই তার চাকা মাটি ছাড়ল।

'উ-ড়ে-ছে!' উল্লাসে চিৎকার করল জনতা।

বেজে উঠল সঙ্গীত, বাতাসে উড়ল টুপি। অন্যদিকে বিশাল একটা ক্যানভাস ছাউনির মতো হ্যাঙ্গার থেকে বেরিয়ে আসছে নতুন যন্ত্র।

'উড়ন্ত বইয়ের তাক'

প্রথম দিককার বিমানগুলোকে প্রায়ই বলা হত 'উড়ন্ত বইয়ের তাক'। তাকের কথাই মনে পড়ত তাদের স্ট্যান্ড, খোপ, পার্টিশান দেখে। তাতে ওড়ায় বিপদ ছিল, তাতে উঠে আকাশে আবার নানারকম জটিল কিছু কসরত দেখাতে হলে প্রয়োজন ছিল খুবই দুঃসাহসের। 'উড়ন্ত তাককে' ভাসতে দেখে লোকে হিম হয়ে যেত উচ্ছ্বাসে। বাচ্চারা কিন্তু আহ্লাদে আটখানা। চেনা বৈমানিকের বিমান ওরা চিনতে পারত দূর থেকেই। 'দ্যাখ, দ্যাখ, মিশা কাকু উড়ছে!' প্রথম রুশ বৈমানিক, বিখ্যাত রেকর্ডধারী মিখাইল এফিমোভকে তারা ঐ নামেই ডাকত।

এই হল সেই 'উড়ন্ত বইয়ের তাক'। এমন বিমানে ওড়ার ঝুঁকি নিতে রাজি ছিল না সবাই।
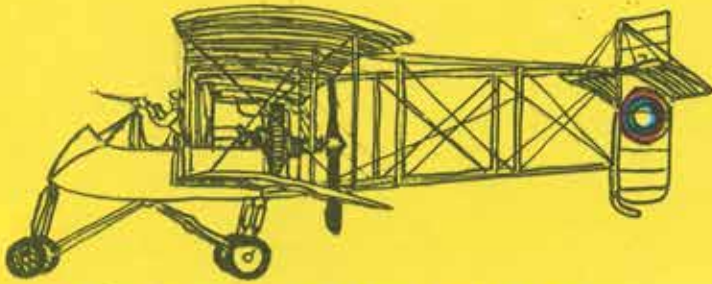
'উয়াজেন' এরোপ্লেন — প্রথম দিককার একটি জঙ্গী বিমান।
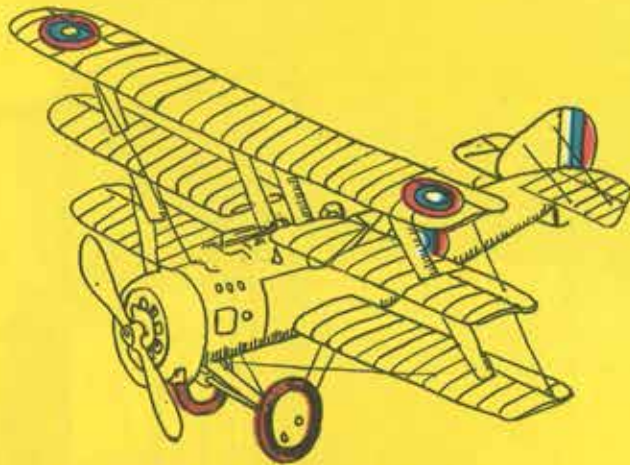
তিন সারি ডানার ব্রিটিশ জঙ্গী বিমান ট্রাইপ্লেন 'সপ্‌ভিচ'।

১৯১৪-১৯১৮ সালের প্রথম বিশ্বযুদ্ধে বিমান লড়াই।
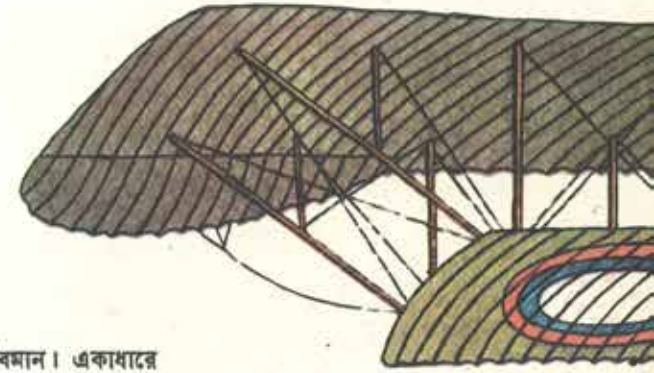
'ফারমান' বিমান। একাধারে তা ব্যবহৃত হতে পারত তালিম, ক্রীড়া ও লড়াইয়ে।
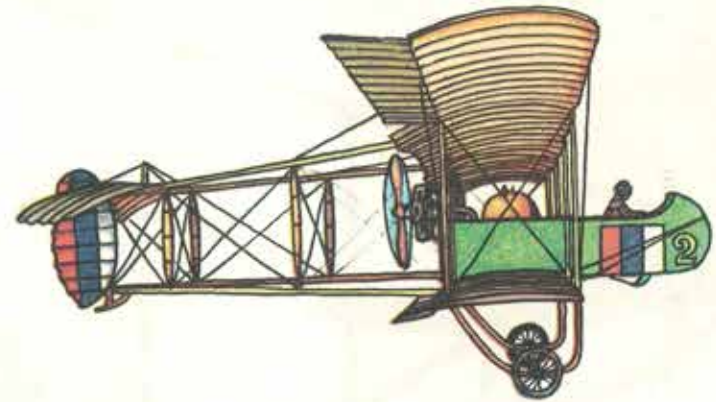
বায়ুচর মহাবীর

প্রত্যেকটা বিমানেরই আছে নিজ নিজ নাম। প্রায়ই তাদের নাম দেওয়া হয় ডিজাইনারদের নামে: 'রাইট', 'ফারমান', 'উয়াজেন', 'ব্লেরিও'... আমাদের 'তু', 'ইল', 'ইয়াক'ও ধারণ করে আছে তাদের ডিজাইনারদের নাম: তুপোলেভ, ইলিউশিন, ইয়াকভলেভ। কিন্তু দুনিয়ায় প্রথম চার ইঞ্জিনের বিমান পেল মহাগাথার বীর ইলিয়া মুরোমেৎস-এর নাম। রাশিয়ায় এটি নির্মিত হয় ১৯১৩ সালে আর সে সময় এটি ছিল সত্যিই মহাবীর। 'ইলিয়া মুরোমেৎস'এর ওজন ছিল প্রায় চার টন। কিন্তু শক্তি অসাধারণ। একসঙ্গে পনের জন যাত্রীকে তা আকাশে তুলতে পারত।

কান ফাটানো গর্জন তুলে বিমান যখন পিটার্স-

রুশ ইঞ্জিনিয়ার সিকোর্স্কি নির্মিত চার ইঞ্জিনের ভারী বোমারু বিমান 'ইলিয়া মুরোমেৎস'।

আরো একটা গুরুভার বিমান। মহাবীরের মতো 'পা', মহাবীরের মতো ডানা আর নামটাও মহাবীরের — 'স্ভিয়াতোগোর'।

বুর্গের ওপর দিয়ে উড়ে যেত, রাস্তায় থেকে যেত যানবাহন, চকে গিয়ে ছটফটিয়ে উঠত ঘোড়ারা, আর লোকে মুখ তুলত এই সৃষ্টিছাড়া যন্ত্রটাকে দেখতে।

কিন্তু যাত্রী বওয়া তার ভাগ্যে ছিল না বেশি দিন। এক বছর বাদে শুরু হল বিশ্ব যুদ্ধ আর গোলাগুলি নিল 'ইলিয়া মুরোমেৎস'। কেবিনে ভরা হল বোমা, লেজে বসানো হল মেসিনগান, আর পাইলটের পাশেই আসন নিলে গুপ্ত সন্ধানী পর্যবেক্ষক। 'হুঁশিয়ার শত্রু, মাটিতে গা ঢাকা দে! সঙিন যেখানে চলবে না, বোমায় কাজ দেবে।'

যুদ্ধ চলছে, এদিকে এগিয়ে এল বিপ্লব। মহাবীর তখন তার বলিষ্ঠ ডানায় আঁকলে লাল তারা, গেল লাল ফৌজের সাহায্যে। ওইখান থেকেই আমাদের মহাবীর — আমাদের বিখ্যাত বোমারু বংশের জন্ম।

দূরত্বের রেকর্ড

না থেমে দূর পাল্লায় ওড়ার জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নে বানানো হয় বিশেষ বিমান 'আন্ত-২৫'। ডানা তার খুবই লম্বা, আর ওড়ার সময় তার ভেতরকার কাঠামো গুটিয়ে নেয়া যায়।

স্টিয়ারিং কণ্ট্রোলে বসলেন প্রখ্যাত বৈমানিক মিখাইল গ্রমোভ। স্টার্ট দিলেন ইঞ্জিনে, লাল ডানার বিমান ছুটল উড্ডয়ন পথ দিয়ে। ইঞ্জিনিয়াররা টুপি নেড়ে চিৎকার করলে:

প্রথম পূর্ণ ধাতব বিমান 'আন্ত-২', সোভিয়েত ইউনিয়ন।

৩০-৪০ এর দশকে উড্ডয়নের পোশাক। গরম স্যুট, ফারের বুট আর দস্তানা বৈমানিককে বাঁচাত ঠাণ্ডা হাওয়া থেকে।

'ডুবিও না মিখাইল মিখাইলিচ! শুভ যাত্রা।'

গ্রমোভের বিমান দেশে পাক দিল তিন দিন। ডায়ালে পরিষ্কার ফুটে উঠল দূরত্ব — ৩০০০... ৫০০০... ১০,০০০... কিলোমিটার। দূর উড্ডয়নের বিশ্ব রেকর্ড ভেঙে বিমান মস্তো পাক দিয়েই চলেছে। শেষ পর্যন্ত যখন তিনি মাটিতে নামলেন, ডায়ালে দেখা গেল ১২,৪০০ কিলোমিটার।

'ধন্যবাদ!' ইঞ্জিনিয়ারদের করমর্দন করে বললেন গ্রমোভ, 'চমৎকার যন্ত্র!'
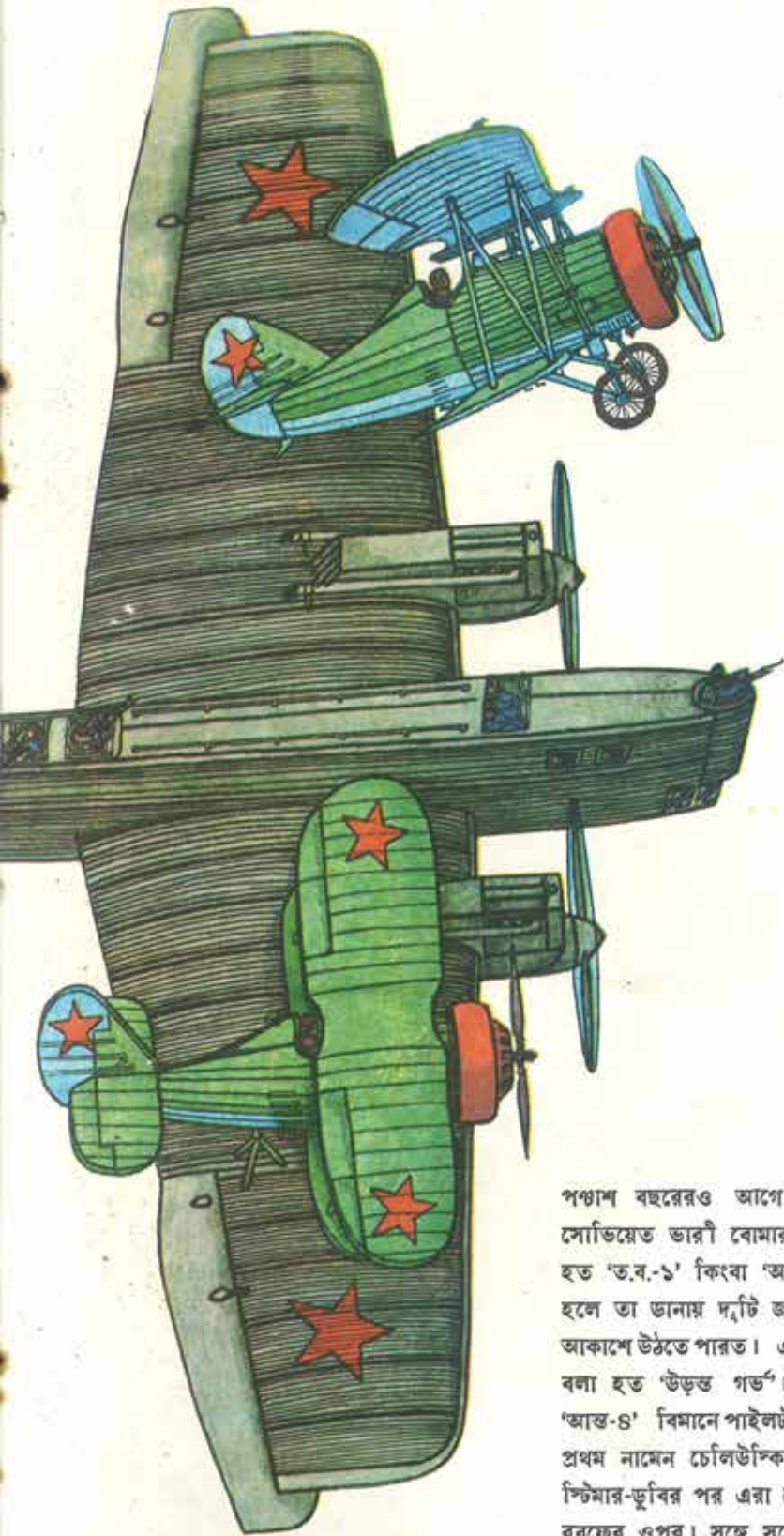
পঞ্চাশ বছরেরও আগে বানানো প্রথম সোভিয়েত ভারী বোমারু বিমানকে বলা হত 'ত.ব.-১' কিংবা 'আন্ত-৪'। প্রয়োজন হলে তা ডানায় দুটি জঙ্গী বিমান নিয়ে আকাশে উঠতে পারত। এধরনের বিমানকে বলা হত 'উড়ন্ত গর্ভ'। ১৯৩৪ সালে 'আন্ত-৪' বিমানে পাইলট লিয়াপিদেভ্স্কি প্রথম নামেন চেলিউস্কিনদের ছাউনিতে। স্টিমার-ডুবির পর এরা থেকে যায় ভাসন্ত বরফের ওপর। সঙ্গে সঙ্গেই তা ১২ জন যাত্রী তুলে নেয় — সবই নারী আর শিশু। সে সময় 'আন্ত-৪'কে ধরা হত অন্যতম সেরা ভারবাহী বিমান বলে।

১৯০৯ সাল
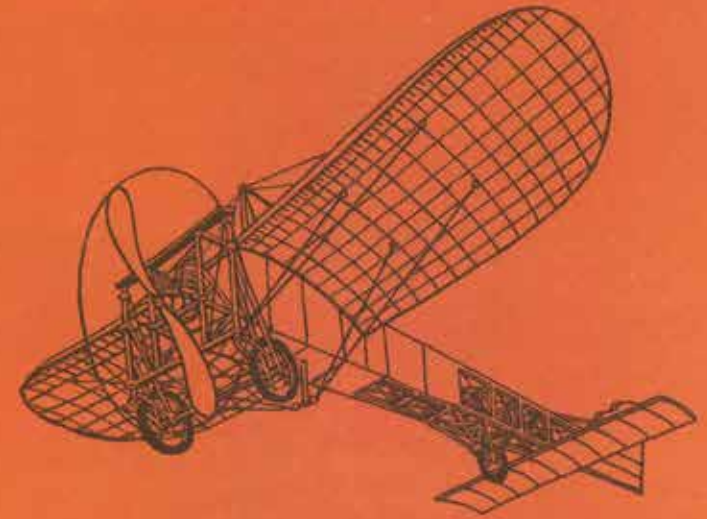
'ব্লেরিও-১১' মনোপ্লেন প্রথম উড়ে যায় লা-মাঁশ প্রণালীর ওপর দিয়ে।

১৯২৭ সাল
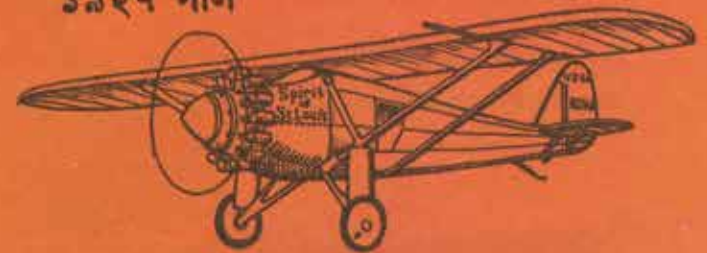
না থেমে মহাসাগর পেরিয়ে আমেরিকা থেকে ইউরোপে — 'সাঁ লুই প্রেরণা' বিমানে এই ছিল চার্লস লিণ্ডবার্গের যাত্রাপথ।

১৯৩৭ সাল

ভালেরি চ্কালভের অধিনায়কত্বে 'আন্ত-২৫' বিমানের চালকেরা প্রথম উত্তর মেরু ডিঙিয়ে উড়ে যান আমেরিকায়।

১৯১৩ সাল

রুশ সামরিক বৈমানিক প. ন. নেস্তেরভ প্রথম বিমান চালান 'মরণ ফাঁসে' এবং উচ্চ শ্রেণীর বিমানচালনার সূত্রপাত করেন।

১৯৪১ সালে ফ্যাসিস্টদের সঙ্গে প্রথম লড়াইগুলোর বীর 'ই-১৬' বেগবান জঙ্গী বিমান।
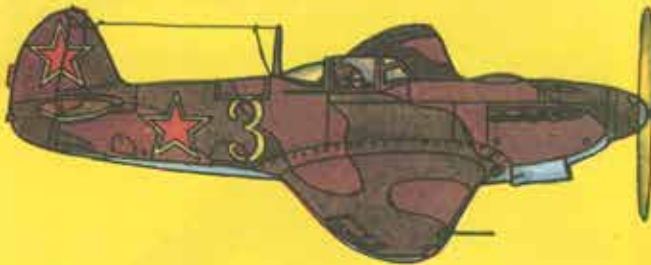
'ইয়াক-৯' জঙ্গী বিমান উড়ত শুধু দ্রুত নয়, সুদূরেও, তাই তাকে বলা হত দূর ক্রিয়ার জঙ্গী বিমান।

'ইল'-এর আক্রমণ

এটা যুদ্ধের সময়কার একটা ঘটনা। ফ্রণ্টের একটা জায়গায় আমাদের প্রতিরক্ষা ভেদ করবে বলে ঠিক করে ফ্যাসিস্টরা। দু'শ ট্যাঙ্ক জড়ো করে আক্রমণে পাঠায় তাদের। ভারী ক্যাটারপিলের নিচে ঘর্ঘর করে উঠল মাটি, ইঞ্জিনের গর্জনে কাঁপতে থাকল বাতাস। আমাদের কামানগুলো ঘা মারলে ট্যাঙ্কে, ঘায়েল করলে দশটাকে, পরে আরো বিশটা...

অনেকখন ধরে লড়াই চলেছিল, কিন্তু শক্তি ছিল অসমান। গোলা ফুরিয়ে আসছে, কম ট্যাঙ্ক ঘায়েল হয় নি, তাহলেও এগুচ্ছে তারা।

হঠাৎ বনের পেছন থেকে দেখা দিল এক স্কোয়াড্রন বিমান লাল তারা মার্কা। এরা এসেছে

হানাদার 'ইল-২'। তার পেট্রল ট্যাঙ্ক ছিল শত্রুর গুলির কাছে দুর্ভেদ্য। ফাটল এ'টে বসত আপনা থেকেই।

ছোঁ-মারা বোমার বিমান 'তু-২'; একাধারে তা গুপ্ত সন্ধান, শত্রু বিমানের সঙ্গে লড়া, হানা দেওয়া আর টর্পেডো বওয়ার কাজ করত।

'পো-২'; তাকে 'ভুট্টা' বলে ডাকলেও সমীহ করত লোকে, কেননা বিমানপথে সে ছিল ৩০ বছর। ১৯৪১-১৯৪৫ সালের যুদ্ধের সময় তা নৈশ বোমারুর কাজ করে।

জঙ্গী বিমান 'লা-৫'; যুদ্ধের সময় এতে চেপে বৈমানিক কোজেদুব ভূপাতিত করেন ৬২টি ফ্যাসিস্ট বিমান।

সাহায্যের জন্য — আমাদের ভয়াবহ হানাদার 'ইল' বিমান। প্রতিটি বিমানে বোমা, কামান, জেট গোলা। প্রত্যেকটারই দুর্ভেদ্য সাঁজোয়া সাজ। একেবারে উড়ন্ত ট্যাঙ্ক আর কি। ওদের একটা খাড়াই ঘুর নিয়ে নেমে গেল নিচে, একেবারে মাটির কাছাকাছি। তার পেছনে আরেকটা, আরেকটা... বোমা ফেলল তারা, শত্রুর যন্ত্রগুলোয় আগুন ধরিয়ে দিল। জ্বলন্ত ট্যাঙ্ক থেকে লাফিয়ে পড়তে শুরু করল ফ্যাসিস্টরা আর অমনি লুটিয়ে পড়ল মেসিনগানের গুলিতে।

'শ্‌ভার্ৎসে টড!' আতংকে চেঁচাল তারা। জার্মান ভাষায় এর অর্থ — 'কালো মরণ'। আমাদের বিখ্যাত 'ইল-২' বিমানের এই নাম দিয়েছিল ফ্যাসিস্টরা।

ক — পাখনা।
খ — ঘোরাবার স্টিয়ারিং।
গ — স্থিতিস্থাপয়িতা।
ঘ — ওপরে ওঠার স্টিয়ারিং।
ঙ — ডানা।
চ — এলেরন বা কাত করার স্টিয়ারিং।
ছ — গতিবেগ মাপার নল।
জ — রেডিও যোগে চালিত রকেট।
ঝ — বৈমানিকের কেবিন।
ঞ — জেট ইঞ্জিনের নজ্‌ল্‌।
ট — জ্বালানির ঝুলন্ত ট্যাঙ্ক।
ঠ — কাঠামো।
ড — পেছন থেকে আক্রমণের হুঁশিয়ারি দেবার লোকেটারের এরিয়েল।
ঢ — বারুদ রকেট ইঞ্জিনের বহির্গামী বর্জ্য স্রোত।
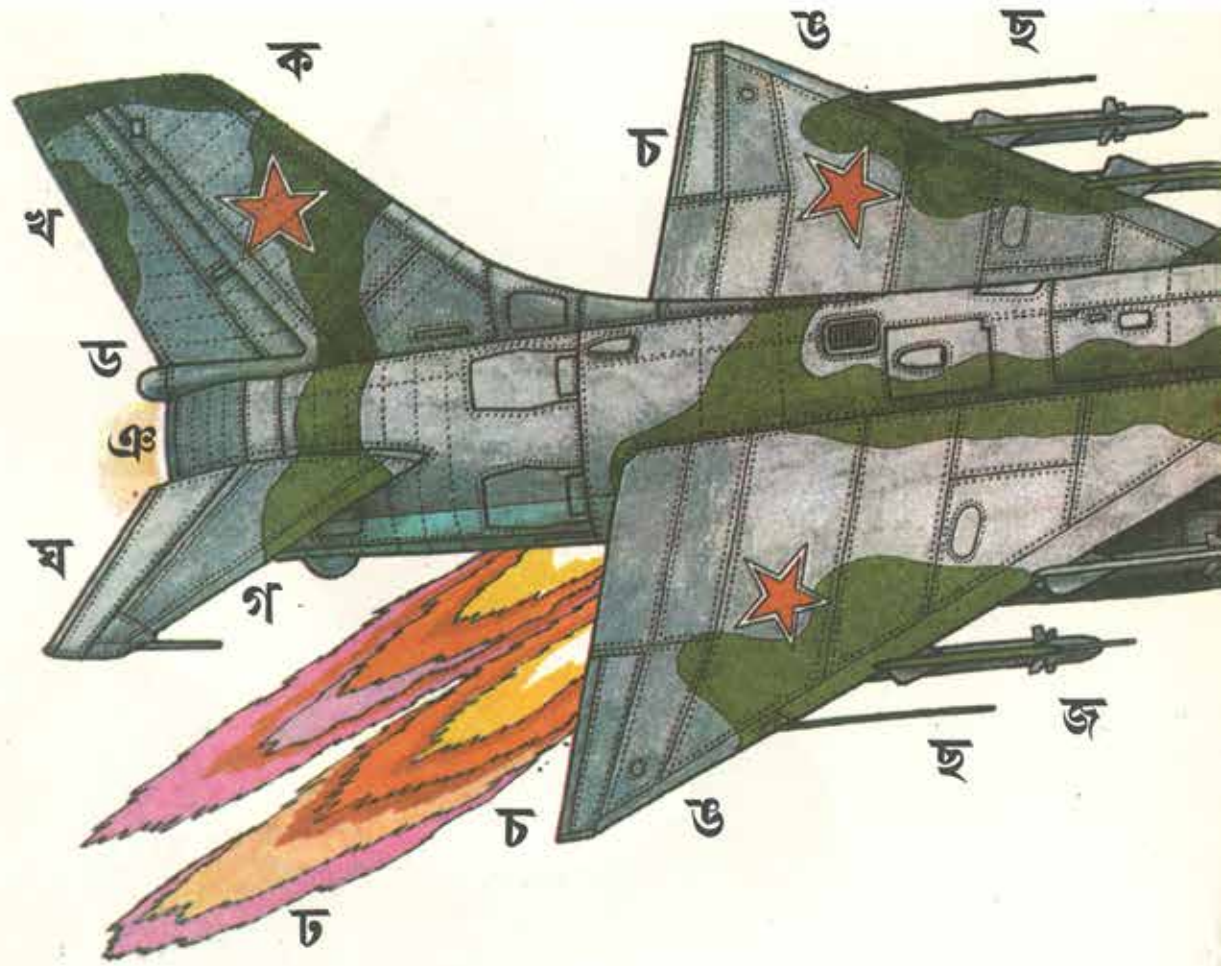
ধ্বনির চেয়ে দ্রুত

বিমানের প্যারেড শেষ হয়ে আসছিল, এমন সময় আকাশে দেখা দিল একদল হানাদার বিমান। উড়ছিল তারা নিঃশব্দে, পাখির মতো, আর যখন তারা চোখের আড়াল হল, এরোড্রোমের ওপর কেবল তখনই শোনা গেল বজ্রধ্বনির মতো বিলম্বিত আওয়াজ।

'হ্যাঁ, একেই বলে গতি!' অবাক হল লোকেরা, 'ভেবে দ্যাখো একবার, শব্দকে ছাড়িয়ে গেছে!'

মস্কোর লোকেরা সেদিন প্রথম দেখল ধ্বনির চেয়ে দ্রুতগামী জেট বিমানের ওড়া।

বাণ-বিমান, গোলা-বিমান, রকেট-বিমান... কত রকম তুলনাই না দেওয়া হয়েছিল এদের! আর সত্যিই, জেট বিমানের ডানা মনে হবে বিশাল এক তীরের পুচ্ছ, কাঠামোটা যেন গোলার গা, ইঞ্জিনটা রকেট জাহাজের মতো। বৈমানিকদের পোশাকও মনে করাবে মহাকাশচরদের কথা। যে প্রচণ্ড গতিতে বিমান ওপরে ওঠে, তাতে অতি-চাপের ভয় থাকে না এ পোশাকে। এক সেকেণ্ডেই তো বিমান উঠে যায় মেঘে।

ছোট্ট এই কাহিনীটা তোমরা পড়ে উঠতে না উঠতেই বিমান পৌঁছে যাবে স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারে।

হানাদার বিমানের জায়গায় এসেছে রকেট সজ্জিত বিদ্যুৎগতি জেট জঙ্গী ও বোমারু বিমান। শক্তিশালী ইঞ্জিন আর ত্রিভুজাকৃতি ডানায় বেগ বাড়ানো যায় অনেক।

বিপুল গতিতে উড়তে হলে শুধু তালিম নয়, বিশেষ ধরনের পোশাকও দরকার।

জঙ্গী জেট বিমান 'ইয়াক-১৫' বাইরের চেহারায় সাধারণ প্রপেলার চালিত বিমান থেকে তখনো বিশেষ আলাদা কিছু নয়।

১৯১০ সাল

প্যারিসের বিশ্ব প্রদর্শনীতে প্রথম দিককার একটি জেট বিমান।

'মিগ-১৫'। সামরিক জেট বিমানগুলির মধ্যে এটি সংখ্যাবহুলদের অন্যতম।

বিমান কেন ওড়ে?

ভালের্‌কার বাবা বৈমানিক, যাত্রী নিয়ে যান ভলোগ্‌দায়, আবার ফেরেন যাত্রী নিয়ে।

ভালের্‌কা একদিন জিগ্যেস করল:

'আচ্ছা বাবা, বিমান ওড়ে কেন?'

'জানি, জানি, বাতাসে তো!' হেসে উঠলেন বাবা। কিন্তু ভালের্‌কা গুরুত্ব দিয়েই প্রশ্ন করেছে লক্ষ করে বোঝাতে লাগলেন: 'বিমানের থাকে ইঞ্জিন, প্রপেলার আর ডানা। ইঞ্জিন প্রপেলার ঘোরায়, প্রপেলার বাতাস কেটে বিমানকে টেনে নেয় আর হাতের বদলে ডানা বিমানকে ধরে রাখে বাতাসে।'

'কিন্তু তোমার বিমানে প্রপেলার নেই কেন?' জিগ্যেস করল ভালের্‌কা।

'আমারটা জেট বিমান, কী দরকার ওর প্রপেলারের? ইঞ্জিনে জ্বালানি পুড়ে যে তপ্ত

আধুনিক যাত্রী বিমানে পাইলটের কেবিন অতি বিভিন্ন, অসংখ্য সব কলকব্জায় সজ্জিত।

ক — রেডিওলোকেটার।
খ — পাইলটের কেবিন।
গ — যাত্রীদের সালোঁ।
ঘ — দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে বেরুবার পথ।
ঙ — রেডিও স্টেশনের এরিয়েল।
চ — মাঝারি ইঞ্জিনের বায়বীয় চ্যানেলের প্রবেশমুখ।
ছ — মাঝারি ইঞ্জিনের বহির্গামী বর্জ্য গ্যাসের নজ্‌ল্‌।
জ — পার্শ্বস্থ ইঞ্জিন।
ঝ — ঘোরাবার স্টিয়ারিং সমেত পাখনা।
ঞ — ওপরে ওঠার স্টিয়ারিং সমেত স্থিতিস্থাপয়িতা।
ট — নামবার সময় ব্রেক কষার পাত ও এলেরন সমেত বাঁ দিককার ডানা।
ঠ — সংকেত বাতি।
ড — প্রধান কাঠামোর খাড়া বর্গা।
ঢ — সামনের কাঠামো।
ণ — যাত্রীদের সিঁড়ি।
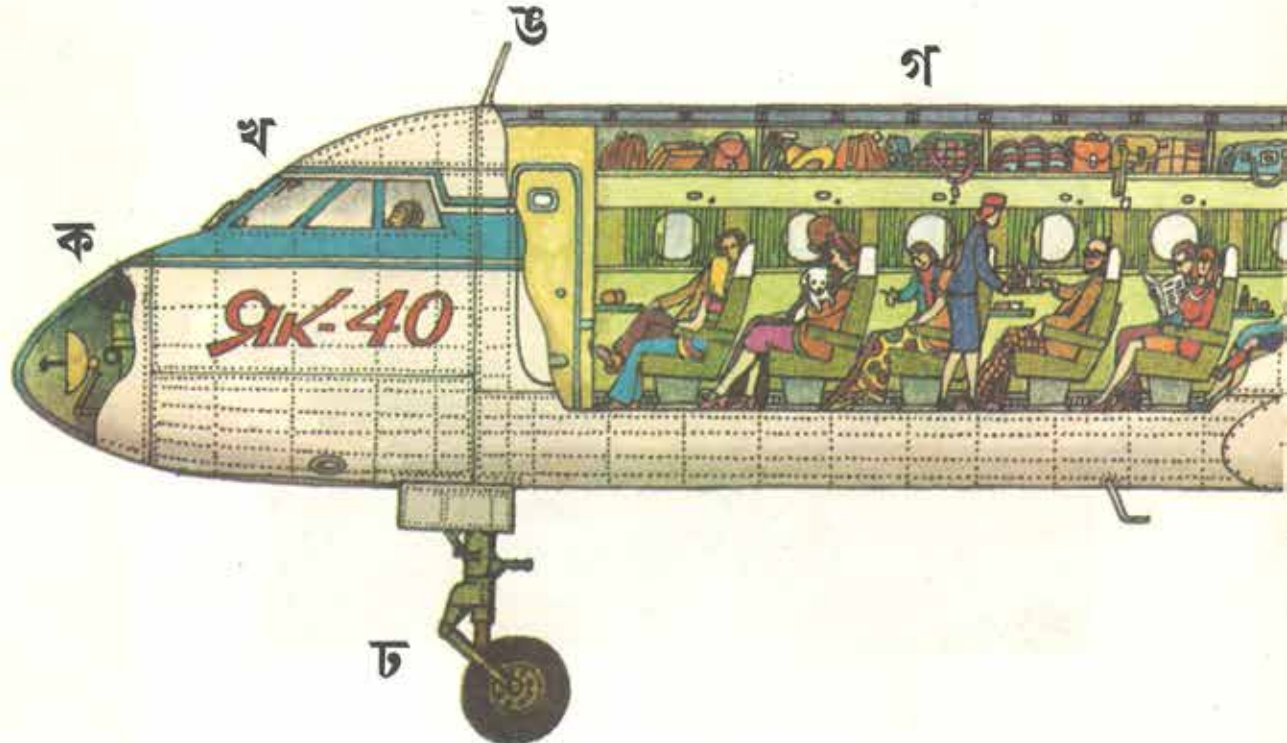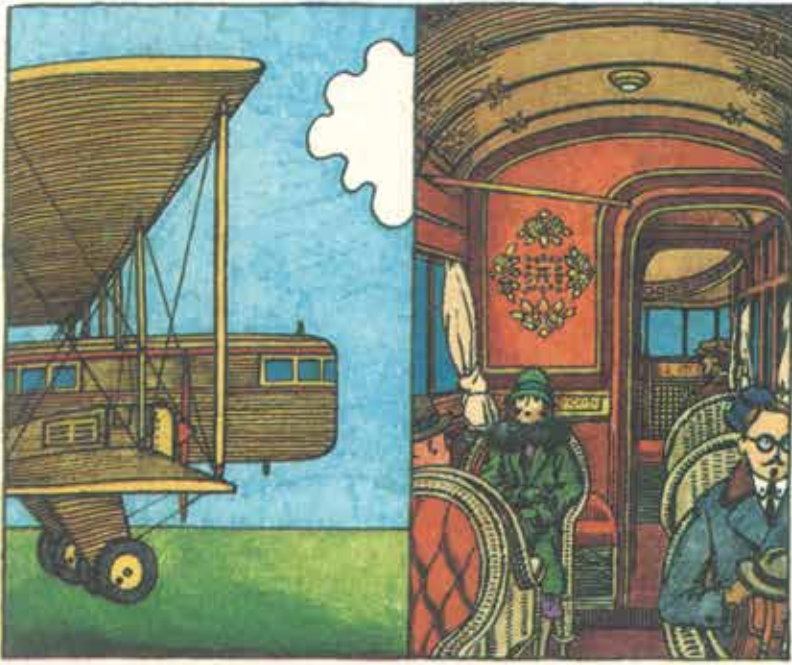
'গোলিয়াফ' মানে 'দানব'। বিশের দশকে এটি ছিল বৃহৎ যাত্রীবাহী বিমানগুলির একটি। একসঙ্গে ১৪ জন লোক চাপতে পারত তাতে। 'গোলিয়াফে'র সালোঁ ছিল জমকালো।

গ্যাস বেরয়, তাই বিমানকে ঠেলে সামনে। বিমানের পেছনে আগুনে লেজ দেখেছিস? এটা হল সেই গ্যাস।'

বাবার কাছ থেকে আরো অনেককিছু জানল ভালের্কা: বিমানের স্টিয়ারিং থাকে কোথায়, কিভাবে তা চালাতে হয়, বিমানের কলকব্জাগুলো কেমন... এখন ও নিজেই বিমান চালিয়ে নিয়ে যেতে পারে, তবে এখনো তো ছোটো।

ঠ ঞ চ ঝ ঘ ЛОТ CCCP-87786 ছ জ ট ড ণ
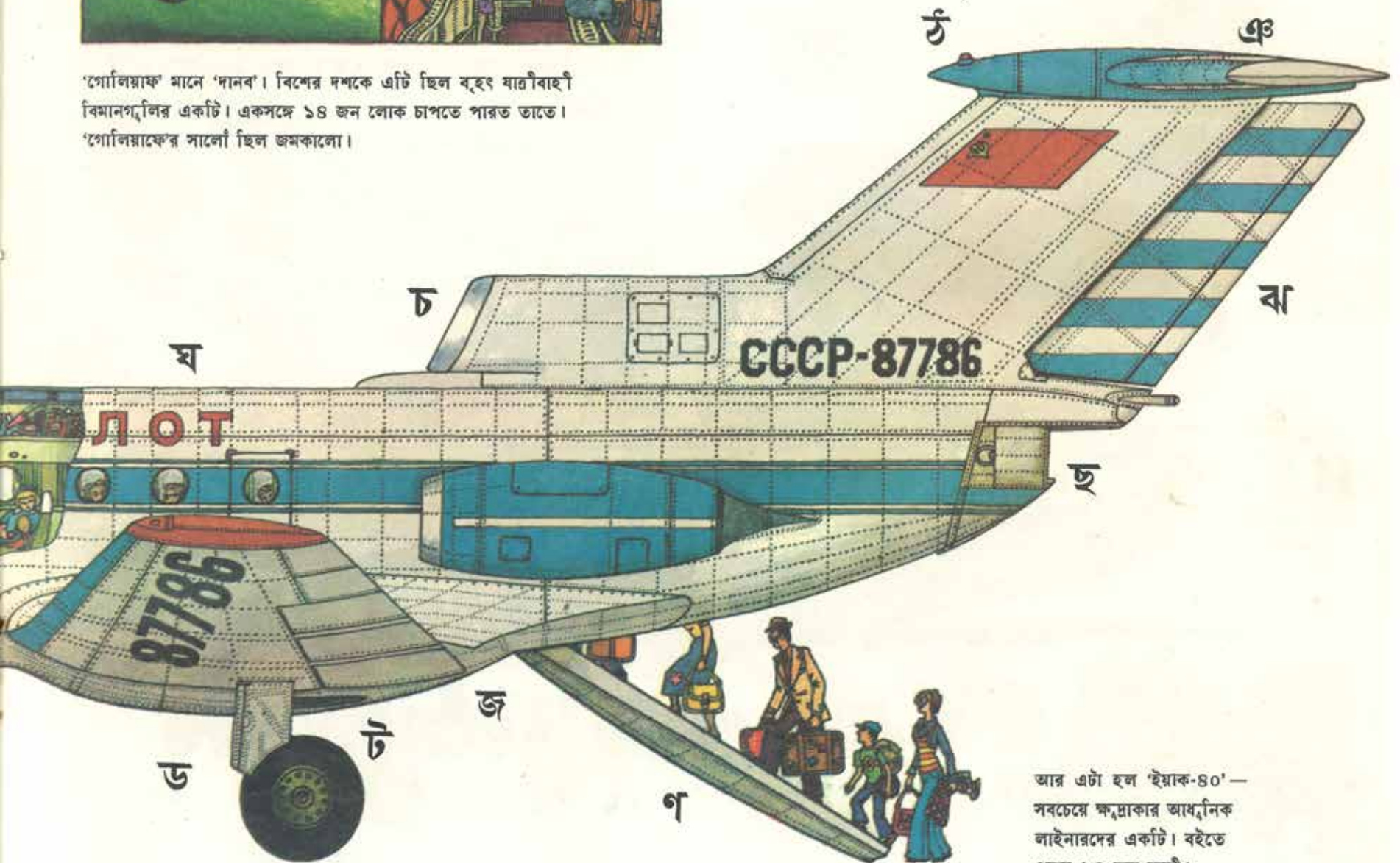
আর এটা হল 'ইয়াক-৪০'— সবচেয়ে ক্ষুদ্রাকার আধুনিক লাইনারদের একটি। বইতে পারে ২৪ জন যাত্রী।

বিমান-বন্দর

মানুষ উড়তে শুরু করা মাত্রই সে আকাশের পথ পাততে থাকে। প্রথমে ছোটো ছোটো, কাছাকাছি শহরগুলোর মধ্যে, পরে দেশ থেকে দেশান্তরে লম্বা পথ। বছর পঞ্চাশেক যেতে না যেতেই সারা পৃথিবী ছেয়ে গেছে বিমান পথের ঘন জালে। দিন রাত আকাশে ছুটছে নানা দেশ ও কোম্পানির পরিচয়জ্ঞাপক চিহ্ন নিয়ে দ্রুতপক্ষ লাইনার। আর পথের শেষে বিমান-বন্দর, সেখানে আছে বিমানের জন্য আশ্রয়, যাত্রীদের জন্য হল, স্ট্যান্ড, বিমানের দৌড় পথ, সংকেত দেবার আলোকস্তম্ভ, অটোকার, পেট্রল যোগানোর ব্যবস্থা।

বিমান-বন্দরের প্ল্যাটফর্মের কাছে সবে মাত্র এসে থামল পক্ষি-দানব 'ইল-৬২'। প্ল্যাটফর্মে লোকের ভিড়, নিজেদের আত্মপরিজনের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে তারা।

'আপনি কোত্থেকে আসছেন?' 'স্টকহোম থেকে।' 'আর আপনি?' 'হাভানা থেকে।' 'হাভানা? কত পথ পাড়ি দিলেন?' 'মাত্র চোদ্দ ঘণ্টার পথ।'

ওদিকে মাইকে চলেছে পরের ঘোষণা: 'ওয়ারশ থেকে বিমান নামল। ফ্লাইট নম্বর ৮৯০...'

বিমান-বন্দর। তাকে যে নগরের আকাশ তোরণ বলা হয় সেটা মিথ্যে নয়।

জেট হেলিকপ্টারের একটি প্রকল্প।

রোটারি-উইঙ্ বিমান। এ যন্ত্রের প্রপেলার ডানায়। ওঠে তা হেলিকপ্টারের মতো, আর উড়ে চলে যেন বিমান।

'কা-২৬' হেলিকপ্টার। কতই-না তার কাজ: একাধারে তা ভূতত্ত্ব সন্ধানী, অগ্নিনির্বাপক, খেতে ওষুধ ছড়ায়, ক্রেনের কাজ করে।

উপহার

সাইবেরিয়ার সুদূর তাইগায় রেলপথ পাতা হচ্ছিল। যে দিকেই তাকানো যাক, ঘন বন আর জলা। ট্রেনে করে যাওয়া যাবে না, পেঁছনো যাবে না স্টিমারে। তাহলে বিমান? কিন্তু কাছাকাছি বিমান-বন্দর নেই একটাও — ওড়াও যাবে না, নামাও যাবে না। একমাত্র পরিবহণ হেলিকপ্টার। নামবার জন্য বনের মধ্যে একটু ফাঁকাই তার পক্ষে যথেষ্ট। আর উড়তে পারে দৌড় ছাড়াই, সরাসরি নিজের জায়গাটি থেকেই। দৌড় দরকার পাখার জন্য। আর পাখার বদলে হেলিকপ্টারের আছে প্রপেলার। প্রপেলার ঘুরে বাতাস টানে, হেলিকপ্টারও উঠে যায় ওপরে।

নির্মাণে হেলিকপ্টার ছিল প্রথম সহায়। কী সে করে নি: খাবার পেঁছে দিয়েছে, চিঠিপত্র দেওয়া-নেওয়া করেছে, খেটেছে ক্রেনের বদলি হয়ে, ভারী ভারী রেল নিয়ে গেছে।

একদিন হেলিকপ্টারের কম্যান্ডার নির্মাতাদের কাছে এসে বললে:

'কাল অতিথির অপেক্ষায় থাকবেন। কর্তা আসবেন বন্ধুবান্ধব নিয়ে।'

'কর্তা মানে?' হেসে উঠল সবাই, 'তাইগায় একমাত্র কর্তা হল গে ভালুক।'

কোনো জবাব না দিয়ে বৈমানিক চলে গেল।

পরের দিনটা ছিল রবিবার। সবাই উঠল দেরি। শোনা গেল ইঞ্জিনের পরিচিত গুরু গুরু আওয়াজ। সবাই ছুটল মাঠে। তাকিয়ে দেখে চোখকেও বিশ্বাস হয় না। মাঠের মাঝখানে মস্তো এক তাঁবু, তাতে সাইনবোর্ড — 'সার্কাস'। আর সাইনবোর্ডের ওপর — ভাবো একবার — জ্যান্ত বানর। বসে বসে মুখ বাঁকাচ্ছে। তাদের ওপরে হেলিকপ্টার — সিঁড়ি তার নামিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর নিচে, মাটিতে সার্কাসের শিল্পীরা, জন্তুজানোয়ারের খাঁচা, আর লাল কামিজ পরা, মুখসাজ আঁটা স্বয়ং কর্তা — মিখাইল ইভানোভিচ ভালুকটি।

নির্মাতাদের আনন্দ আর ধরে না: 'হুররে! সার্কাস এসেছে! হ্যাঁ, একেই বলে উপহার! সাবাস হেলিকপ্টার!'

যখন তুমি বড়ো হবে

তুমি বসে আছ ধ্বনির চেয়ে দ্রুতগামী উড়ন্ত লাইনারের কেবিনে, লজেন্স খেতে খেতে তাকিয়ে দেখছ জানলা দিয়ে। মনে হবে সীমাহীন তুষার-খেতের মাঝখানে বিমান যেন দাঁড়িয়ে আছে, যদিও মোটেই তা দাঁড়িয়ে নেই, ছুটছে ঘণ্টায় ২৫০০ কিলোমিটার গতিতে। তুষার-খেতও কিছু নেই, স্রেফ আমাদের বিমান উঠেছে ২০ কিলোমিটার উঁচুতে, উড়ছে মেঘের ওপর দিয়ে। আর যদি জঙ্গী বিমানে চাপতে তাহলে তা উঠত আরো উঁচুতে, ২৫, এমনকি ৩০ কিলোমিটার। আপাতত এইটেই সীমা, বৈমানিকেরা যাকে বলে 'সিলিং'। এর চেয়ে উঁচু ওড়ে কেবল রকেট আর স্পুতনিকেরা।

ধ্বনির চেয়ে দ্রুতগামী প্রথম যাত্রীবাহী বিমান 'তু-১৪৪'।

কিন্তু বেশ হয় এমন বিমান তৈরি করতে পারলে, যাতে উড়ে যাওয়া যাবে মহাজগতে, নামব মহাজাগতিক স্টেশনে, তারপর আবার ফিরে আসব নিজের এরোড্রামে। যখন তুমি হয়ে উঠবে সাবালক, তখন সম্ভবত অমন বিমান দেখা দেবে আর কে বলতে পারে, উড়ো জাহাজকে তুমিই হয়ত চালিয়ে নিয়ে যাবে মহাজগতে।

К. Арон

ЧЕЛОВЕК ПОДНЯЛСЯ В НЕБО

На языке бенгали

K. Aron

MAN SOARES TO THE SKIES

In Bengali

ছোট শিশুদের জন্য

অনুবাদ: ননী ভৌমিক

সোভিয়েত ইউনিয়নে মুদ্রিত

A $\frac{4803010102—181}{031(01)—84}$ 314—83